৯

সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা

এটিএম মোরশেদ আলম

এই অধ্যায়ে জরুরি বিধিমালা প্রত্যাহার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান, জরুরি বিধির পছন্দ মোতাবেক প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামি সংগঠনকে সভা-সমাবেশ করার অনুমতি কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছে। 'সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ অভিযান'-এর নামে সরকারের গণগ্রেফতারের আশ্রয় নেয়া, সেই সাথে বছরজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা– এ বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

আইনি ও নীতিগত কাঠামো

সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক সনদের আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীনে রাষ্ট্র ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতাসহ সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বাধ্য।[১] ১১ জানুয়ারি ২০০৭ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০০৮ প্রত্যাহার করা পর্যন্ত এসব অধিকার স্থগিত ছিল এবং সাংবিধানিক প্রতিকার চেয়ে রিট মামলার মাধ্যমে এগুলো

১ সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদের বিধান হলো সকল নাগরিক শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকারী হবে। আবার, ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের সংগঠন করার অধিকার থাকবে। তবে সাংবিধানিকভাবেই এই অধিকারগুলো নিরঙ্কুশ নয়। আইন দ্বারা জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এগুলোর ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়।

আইনত বলবৎ করারও কোনো সুযোগ ছিল না। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে জরুরি বিধিমালা কিছুটা শিথিল করা হয়।

জরুরি বিধিমালা আংশিক প্রত্যাহার

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে জারিকৃত জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা রাজনৈতিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়নের সব সভা, সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে (তবে ব্যতিক্রম ছিল– ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কারণে সভা-সমাবেশ) এবং সেই সাথে ছাত্র-শিক্ষকসহ সব পেশাজীবী সংগঠনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো ব্যক্তি এসব বিধিনিষেধের কোনো একটি ভঙ্গ করলে তার জন্য অনধিক পাঁচ বছর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়। ১২ মে ২০০৮ প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে সীমিত পরিসরে, শুধু ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচ-ালনার অধিকার প্রদান করেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ রাখা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম আংশিক চালু

১১ জানুয়ারি ২০০৭ জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারির সাথে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং প্রায় দুই বছর দেশে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সরকার একটি আদেশ জারির মাধ্যমে নয়টি শর্তসাপেক্ষে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে।[২] উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো হলো– ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সীমিত আকারে করা যাবে; সংশ্লিষ্ট মহানগর পুলিশ কমিশনার বা ক্ষেত্রবিশেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে সিবিএ (কালেক্টিভ বার্গেনিং এজেন্ট) নির্বাচন করা যাবে; কোনো সভা করার ৪৮ ঘণ্টা আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে (মহানগর পুলিশ কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা কর্মকর্তা) নোটিশ প্রদান করতে হবে এসব সভায় একশ' জনের বেশি অংশ নিতে পারবে না; পাঁচশ' বা তার বেশি লোকের সভা করার জন্য পুলিশ বা প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে এবং এসব সভা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয়ে বা ঘরোয়া পরিবেশে করতে হবে। সভার কার্যক্রম সরাসরি ইলেকট্রনিক

২ 'নয় শর্তে শিথিল হলো ট্রেড ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা', *সমকাল*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

গণমাধ্যমে প্রচার এবং মাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[৩]

জরুরি বিধির বাছাইকৃত প্রয়োগ

জরুরি বিধানগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বাছাই করে প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। মার্চে নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় দল সহিংস প্রতিবাদ মিছিল বের করে; বছরের শেষে তাদের দ্বারা ভাস্কর্য ও মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়। বিপরীতে অন্যান্য প্রতিবাদ সমাবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে; এমনকি নারী উন্নয়ন নীতি বাস্ত বায়নের পক্ষে উন্মুক্ত স্থানে (শহীদ মিনারে) সমাবেশ করারও অনুমতি দেয়া হয়নি।

৮ মার্চ সরকার 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' গ্রহণ করার ঘোষণা প্রদান করে। খেলাফত মজলিসসহ বেশ কিছু ইসলামি সংগঠন এই নীতির বিরোধিতা করে ৯ মার্চ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল করে। কর্মসূচি হিসেবে ১৪ মার্চ তারা বায়তুল মোকাররম মসজিদ (জাতীয় মসজিদ) থেকে বিশাল মিছিল বের করে। তাদের এই মিছিলে পুলিশ কোনোরূপ বাধা দেয়নি। বরং সরকার তার ধর্ম উপদেষ্টার মাধ্যমে তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ঘোষণা দেয়।[৪] জরুরি অবস্থা ভঙ্গ করে হিযবুত তাহরীর, খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী প্রতিরোধ কমিটি. শরিয়া হেফাজত কমিটি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ ৩০টির বেশি ইসলামি সংগঠন মসজিদ ও মাদ্রাসাকে ব্যবহার করে, সহিংস ঘটনায় উস্কানি দেয়াসহ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।[৫]

---

৩ আরো দেখুন : *শ্রমিকের অধিকার* সংক্রান্ত অধ্যায় ১৮।

৪ সকল জাতীয় দৈনিক, ১৪ মার্চ ২০০৮।

৫ 'বারবার জরুরি বিধিমালা লঙ্ঘন, মার খাচ্ছে পুলিশ, সরকার নির্বিকার', *সংবাদ*, ১২ এপ্রিল ২০০৮।

১০ নভেম্বর ২০০৮ দুর্নীতি মামলার দুই আসামি জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, যারা বিগত চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, ঐদিন আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করেন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাদের জেলহাজতে পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনায় জামায়াত কর্মীরা সাত ঘণ্টা সংসদ ভবনে অবস্থিত বিশেষ আদালতের সামনে রাস্তাসহ আশপাশের প্রধান রাস্তা অবরোধ করে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।[৬]

গণগ্রেফতার

প্রচলিত ফৌজদারি আইনে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করার যে বিধান আছে, সেটি অতীতের মতো ব্যবহারের পাশাপাশি জরুরি বিধিমালার ১৬(২) ধারা গণগ্রেফতারের হাতিয়ার হিসেবে যোগ হয়।[৭] ২৯ মে ২০০৮ থেকে ১২ জুন

---

৬ ‘নিজামী ও মুজাহিদের মুক্তির দাবিতে পাঁচ দিনব্যাপী কর্মসূচি’, *প্রথম আলো,* ১১ নভেম্বর ২০০৮।

৭ অতীতে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারাকে এরূপ গণগ্রেফতারের জন্য ব্যবহার করা হতো। এই ধারা অনুসারে পুলিশ কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধ সংঘটিত হতে পারে এই সন্দেহে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে। ঢাকা মহানগরে আইনের অন্য একটি বিধানের মাধ্যমেও গণগ্রেফতার পরিচালিত হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন অর্ডিন্যান্সের ৮৬ ও ১০০ ধারাবলে ঢাকা মহানগল পুলিশ সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে। একই ধরনের আইন অন্যান্য মহানগর যথা- রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেটেও আছে। আসক, ব্লাস্ট এবং অন্যান্য সংগঠন মিলে ২০০৩ সালে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট মামলা দায়ের করে এবং ঐ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত আপিল (সিভিল আপিল নং ৭৩/২০০৪) বর্তমানে আপিল বিভাগে বিচারাধীন আছে। সংগঠনগুলো ২০০৪ সালে ডিএমপি অর্ডিন্যান্সের ৮৬ ধারায় গণগ্রেফতারকে চ্যালেঞ্জ করে অপর একটি রিট মামলা (নং ২১৯২/২০০৪) দায়ের করে। উভয় মামলাতেই

২০০৮ পর্যন্ত দেশব্যাপী পরিচালিত 'সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ অভিযান'-এ গ্রেফতার করা হয় ২০ হাজারেরও বেশি লোককে।[৮] এই সময়ে জরুরি বিধিমালার ১৬(২) বিধিকেই বেশি ব্যবহার হতে দেখা গেছে (কারণ জরুরি বিধিতে জামিন চাওয়ার বিধান নেই), পাশাপাশি সিআরপিসির ৫৪ ধারা এবং ডিএমপি অধ্যাদেশের ৮৬ ধারাও ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে ৯ জুন একটি প্রেস ব্রিফিংয়ে নিশ্চিত করা হয় যে, বিশেষ অভিযানের সময় মোট ২০,০০২ জনকে আটক করা হয়েছে; গ্রেফতারি পরোয়ানায় ১৩,৭৭৮ জন, অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে ১২০ জন, অন্যান্য মামলায় ৫,৯১৩ জন এবং জরুরি বিধিমালায় ১৯১ জন।[৯] পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এই সংখ্যা আরো বেশি বলে উল্লেখ করে বলেন, ২৯ মে থেকে ১২ জুন ২০০৮ পর্যন্ত দেশব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার গ্রেফতার করা হয়েছে, এর মধ্যে গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া বলে গ্রেফতার ১৬,৯৯৭ জন।[১০] তবে একটি পত্রিকা দাবি করে, ২৯ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ৮ দিনে ১২০০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়, যার বেশিরভাগকেই জরুরি বিধিমালার ১৬(২) বিধিতে গ্রেফতার দেখানো হয়।[১১]

১৪৪ ধারার ব্যবহার

জরুরি বিধিমালা বলবৎ থাকার কারণে যে কোনো জনসমাবেশ এমনিতেই নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু তারপরও জনগণের প্রতিরোধ ঠেকাতে একাধিক ক্ষেত্রেই ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। উদাহারণস্বরূপ, ২০০৮ সালের জুন মাসে কক্সবাজার জেলার লামা উপজেলায় ১৮ জন আদিবাসীর জমিসহ ১৫০ একর জায়গা দখল করে নেয় এক্সিম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। কোম্পানির ভাড়া করা সন্ত্রাসীরা সেখানে ৫০ হাজারেরও বেশি গাছ কেটে ফেলে। কোম্পানির এই জবরদখল ঠেকাতে স্থানীয় এলাকাবাসী জমায়েত হতে চাইলে পুলিশ প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে।[১২] অন্য একটি ঘটনায়, বিএনপির দুই গ্রুপ হবিগঞ্জে একই স্থানে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা

হাইকোর্ট নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেফতার না করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তারপরও গণগ্রেফতারের ঘটনা ঘটছে উল্লেখযোগ্য হারেই।

৮ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

৯ *ইত্তেফাক*, ১০ জুন ২০০৮

১০ *সমকাল*, ১৬ জুন ২০০৮।

১১ *সংবাদ*, ৫ জুন ২০০৮।

১২ 'লামায় এক্সিম এগ্রোর ৫০ হাজার চারাগাছ কেটে নেয়ার অভিযোগ: দাঙ্গা ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি', *সমকাল*, ২৪ জুন ২০০৮।

করে ৩১ আগস্ট। পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ঐ এলাকায় তখন ১৪৪ ধারা জারি করে।[১৩]

জরুরি অবস্থার মধ্যেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন

৪ আগস্ট ২০০৮ জরুরি অবস্থার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় দেশের চারটি সিটি করপোরেশন[১৪]এবং নয়টি পৌরসভা নির্বাচন। ২০ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ১৪ জুলাই থেকে ২ আগস্ট মধ্যরাত পর্যন্ত জরুরি অবস্থা শিথিল করা হয়। এই সময়ের মধ্যে নির্বাচনী সভা-সমাবেশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এই নির্বাচন 'সফল ও সুষ্ঠু' হয়েছে, এ দাবি করে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়– জরুরি অবস্থা বজায় রেখেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা সম্ভব।[১৫] কিন্তু নির্বাচনের পর খুলনার রাস্তাঘাটে ব্যালট পেপারের মুড়ি পড়ে থাকতে দেখা যাওয়ায় পরবর্তীকালে বরিশাল ও খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন ফলাফল নিয়ে সংবাদপত্রে ব্যাপক আলোচনা ও প্রশ্ন ওঠে।[১৬]

জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর জাতীয় নির্বাচন

মূলত জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল দুই বছর আগে, ২২ জানুয়ারি ২০০৭। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ জারি করা হয় জরুরি অবস্থা এবং বাতিল করা হয় ২২ জানুয়ারির নির্বাচন। সরকার ঘোষণা করে যে, দুই বছর অর্থাৎ ২০০৮-এর ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ২ নভেম্বর ২০০৮ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। প্রধান দুটি দলের পরস্পরবিরোধী অবস্থার কারণে তিন দফা তফসিল পরিবর্তন এনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ২০ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পুনরায় আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ২২ নভেম্বর একটি নতুন তফসিল ঘোষণা করে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ

---

১৩ 'বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি : হবিগঞ্জের মাধবপুরে ১৪৪ ধারা জারি', *সমকাল,* ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৪ রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও খুলনা সিটি করপোরেশন।

১৫ 'নয়া হিসাব-নিকাশ শুরু', *সমকাল,* ৬ আগস্ট ২০০৮।

১৬ 'জরুরি আইন বহাল রেখে নির্বাচন ও সরকারের জুজুর ভয়', *নয়া দিগন্ত,* ১৮ আগস্ট ২০০৮।

সময় ৩০ নভেম্বর এবং নির্বাচনের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্ধারণ করে।[১৭]

নির্বাচনের তফসিল প্রথমবার ঘোষণার পর সরকার ৩ নভেম্বর জরুরি বিধিমালাতে সংশোধনী এনে সভা-সমাবেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে নিশ্চিত করা হয় যে, নির্বাচনের ২১ দিন আগে থেকে এরূপ সভা-সমাবেশ এবং নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে।[১৮] সরকার ২০০৬ সালের ৯ নভেম্বর সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যে সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৯] ১৬ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

নির্বাচন কমিশন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য নতুন তফসিল ঘোষণা করে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর (জাতীয় নির্বাচনের দু'দিন পর) নির্ধারণ করে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে ২২ জানুয়ারি ২০০৯।[২১]

ফলোআপ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা

২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রেফতারকৃত চার শিক্ষক ১১ জানুয়ারি ২০০৮ মুক্তি পায়। প্রকাশিত সংবাদ মতে, এই ঘটনায় দায়েরকৃত ৫৩টি মামলার মধ্যে ৩৯টি মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে, যেহেতু তদন্তে অপরাধ সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাকি ১৪টি মামলার চার্জশিট দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ১৪টি

---

১৭ নজরুল ইসলাম ও খাদেমুল ইসলাম, 'জেএস ইলেকশন অন ডিসেম্বর ২৯', *নিউ এজ*, ২৪ নভেম্বর ২০০৮।

১৮ 'রাজনৈতিক মিছিল-সমাবেশ জরুরি আইনের পরিপন্থী, সংসদ নির্বাচনের তারিখ ১৮ ডিসেম্বরের তিন সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর থেকে প্রচারণা চালানো যাবে– পুলিশ সদর দপ্তর', *প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০০৮।

১৯ 'সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত, জরুরি আইন শিথিল, নির্বাচনী সভা-সমাবেশ ও গণমাধ্যমের ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই', *প্রথম আলো*, ৪ নভেম্বর ২০০৮।

২০ 'এএল, এলাইজ হেড ফর ল্যান্ড সাইড ভিকটরি', *নিউ এজ*, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮।

২১ 'সংসদ নির্বাচন ২৯ ডিসেম্বর, উপজেলা ২২ জানুয়ারি', *প্রথম আলো*, ২৪ নভেম্বর ২০০৮; নজরুল ইসলাম ও খাদেমুল ইসলাম, 'জেএস ইলেকশন অন ডিসেম্বর ২৯', *নিউ এজ*, ২৪ নভেম্বর ২০০৮।

মামলার আসামি বিধায় পূর্বের মামলা থেকে অব্যাহতি পেলে তাদের অনেকে এখনো আটক আছে।[২২]

বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে এই ঘটনায় সরকার যে এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল, তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় ১১ মার্চ ২০০৮ (এ ধরনের তদন্ত রিপোর্ট খুব কমসংখ্যকই প্রকাশিত হয়েছে, এটি তাদের একটি)। রিপোর্টের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, ঘটনায় শিক্ষকদের কোনো ইন্ধন ছিল না, শিক্ষকরা শুধু ছাত্রদের পাশে ছিল। কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে কোনো মন্তব্য নেই। কিন্তু তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশ নিয়ে পরবর্তীকালে আর কোনো আলোচনা হয়নি বা সপারিশের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। [২৩]

ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ

রাজনৈতিক দলের সংঘাত

জরুরি অবস্থায় সবধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় ২০০৮ সালে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক কম ঘটেছে। কিন্তু এটা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল না। অক্টোবর পর্যন্ত এরূপ সহিংসতায় ছয়টি ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ও ইসলামী ছাত্রশিবির এবং বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে এসব ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত হয়েছে দু'জন এবং আহত হয়েছে ১২৫ জন। তাছাড়া বিএনপি ও পুলিশের সংঘর্ষে মারা গেছে আরো একজন এবং আহত হয়েছে ১০০ জন।[২৪]

---

২২ 'এখনো বাকি সাত মামলা', *সমকাল*, ২৪ জানুয়ারি ২০০৮।

২৩ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : জনসমক্ষে আসছে যে রিপোর্ট', *সমকাল*, ১২ মার্চ ২০০৮।

২৪ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

সারণি ৯.১ : রাজনৈতিক সংঘাত ২০০৮ (অক্টোবর পর্যন্ত)[২৫]

রাজনৈতিক দল	ঘটনা	আহত	নিহত
আওয়ামী লীগ-বিএনপি	৩	৪৫	১
আওয়ামী লীগ-শিবির	২	২৫	
অভ্যন্তরীণ কোন্দল			
বিএনপি-বিএনপি	১	৫৫	১
মোট	**৬**	**১২৫**	**২**

২৫ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।